কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বদলে যাচ্ছে হাওর কৃষি

সবুজে ঘেরা শস্য-শ্যামল প্রাণের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। আবার নদীর দেশ, হাওর-বাওড় বা ভাটির দেশও বাংলাদেশ। ভাটি বাংলার অপরূপ রূপে মাতিয়েছে যেন বাংলার প্রকৃতিকে। দিগন্ত বিস্তৃত হাওর এবং তাদের চৌহদ্দি মিলে আমাদের এই ভাটির বাংলা বা হাওর অঞ্চল।

বাংলাদেশের ভূ-বৈচিত্র্যের এক অনন্য দিক হচ্ছে হাওর। বিশাল ভূ- গাঠনিক অবনমনের সাথে ছোট ছোট নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা আর বিস্তীর্ণ সীমাহীন বিল মিলিয়ে গঠিত হয়েছে এই হাওরাঞ্চল। প্রধানত বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই হাওরসমূহের দেখা মেলে।

হাওরের নামগুলোও বেশ আকর্ষণীয়। টাঙুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, শনির হাওর, টগার হাওর, মাটিয়ান হাওর, দেখার হাওর, হালির হাওর, সানুয়াডাকুয়া হাওর, শৈলচকরা হাওর, বড় হাওর, হৈমান হাওর, কড়চা হাওর, ধলা পাকনা হাওর, আঙ্গারখালি হাওর, নখলা হাওর, চন্দ্রসোনার থাল হাওর, ডিঙ্গাপুতা হাওর এরকম আরও কত বিচিত্র নামের হাওর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাটির এসব জেলায়।

হাওরের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পরিবর্তিত হয়ে ফুটে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে। বর্ষায় হাওরে পানিরাশির ব্যাপ্তি এত বেশি থাকে যে দেখে মনে হয় সমুদ্র। এই সময়ে হাওরের হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য আর দিগন্ত জোড়া অথৈ জলরাশি যে কারোর মন উদাস করে দেয়।

উদ্দাম ঢেউয়ের অবিরাম মাতামাতি আর মন মাতাল করা উদাসী হাওয়া যেন ভুলবার নয়। হাওরে নৌকা ভ্রমণের সুখস্মৃতি যিনি জীবনে একবার পেয়েছেন তিনি বারবার ফিরে যাবেন হাওরের টানে। স্মৃতি আহরণের এই তৃষ্ণা জাগরূক থাকে আমৃত্যু। বাংলার আদি ও আসল রূপ অপরূপ হয়ে ফোটে হাওরেই।

হাওর পাড়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনও হাওর দ্বারা প্রভাবিত। এই অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য, কৃষি সবকিছু হাওরকেন্দ্রিক। তাই এসব ক্ষেত্রে হাওর এলাকার সঙ্গে দেশের অন্যান্য এলাকার বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো।

বাংলাদেশের হাওর এলাকার গঠন ও প্রভাব—

বাংলাদেশের বিশাল অংশ হাওর এলাকা হিসেবে পরিচিত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাক্ষণবাড়িয়া অর্থাৎ এই সাত জেলার প্রায় ৮ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তন নিয়ে হাওর অঞ্চল গঠিত, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-পঞ্চামাংশ।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে ছোট-বড় ৩৭৩টি হাওর রয়েছে। হাওর এলাকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক বসবাস করে যা মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ। বাংলাদেশে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে হাওরের রয়েছে বিশাল প্রভাব। মূলত ধান চাষ, মৎস্য চাষ, হাঁস চাষ, পানি ফলের চাষ, ইত্যাদি এই অঞ্চলের মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর, বছরে ধান উৎপাদন হয় ৫.২৩ মিলিয়ন টন যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাওরে শস্য নিবিড়তা বা ক্রপ ইনটেনসিটি হচ্ছে ১৪৭ শতাংশ। জিডিপিতে হাওরের অবদান ০৩ শতাংশ-এর ২৫ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। হাওর এলাকায় ৩৪ শতাংশ পরিবার প্রান্তিক কৃষক, ৫ শতাংশ পরিবার জাতীয় পর্যায়ের অনেক নিচে এবং ৫১ শতাংশ পরিবার ছোট কৃষক (জাতীয় ৪৯.৫ শতাংশ)। তাছাড়া, ২৮ শতাংশ লোক অতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কৃষি ও কৃষিজীবী মানুষের জীবন জীবিকার ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অতি বৃষ্টি, বজ্রসহ বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে আগাম ও নাবি বন্যা কৃষকের জন্য নিত্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত পাহাড়ি ঢলে নদী ভরাট হওয়ায় নদীতে পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

এপ্রিল মাসে বোরো ধান সংগ্রহের সময় হঠাৎ ভারী বৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাওর অঞ্চল প্লাবিত হয়ে নিমিষেই ব্যাপক ফসল হানি ঘটে। সদ্য বাড়বাড়ন্ত ফসল হারিয়ে কৃষকের মর্মান্তিক আহাজারি হাওর ছাড়িয়ে দেশের অন্য প্রান্তেও অনুরণিত হয়।

বোরো ধান সংগ্রহের মৌসুমে কৃষকের আতঙ্ক ও উদ্বেগের শেষ থাকে না এই ভেবে যে কখন তার শ্রমেঘামে ফলানো সোনার ধান পাহাড়ি ঢলে বিলীন হয়ে যাবে। প্রকৃতির কাছে কাতর মিনতি আর ক’টা দিনের যাতে

ধান কাটার উপযুক্ত হয়। অনেক সময় কৃষকরা ঢল আসার আগেই আধ-পাকা ধান কেটে ঘরে তোলতে চায় কিন্তু কৃষি শ্রমিকের অপ্রাপ্ততা ও অধিক মজুরির কারণে তাও সম্ভব হয় না।

হাওর এলাকার কৃষির উন্নয়ন যাত্রা—

হাওর এলাকার প্রান্তিক কৃষকের কথা চিন্তা করে হাওরকেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনা প্রথম শুরু হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে। হাওর ও জলাভূমি এলাকার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয় কিন্তু হাওর এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

১৯৮২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বোর্ডটি বিলুপ্ত করা হলে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। হাওর এলাকার মানুষ তাদের শিক্ষা- দীক্ষা থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পিছিয়ে পড়ে। জাতির পিতার পর হাওর এলাকার উন্নয়নের সুবাতাস আবার আসতে থাকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে।

১৯৯৮ সালের ৩ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ জেলার মিটামইনে এক জনসভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়নে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের ১০ জানুয়ারি দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড’ এবং বোর্ডের ‘কার্যনির্বাহী কমিটি’ গঠন করা হয়।

এরপর, হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ১৭ নভেম্বর হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তর ঘোষণার নির্দেশ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় হাওর এলাকার জনজীবন, জীবিকা, পরিবেশ-প্রতিবেশসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০১২ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত মোট ২০ বছর মেয়াদি একটি হাওর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুকনো ও বর্ষায় হাওরাঞ্চলের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বহুমুখী ও পরিকল্পিত উপায়ে উদ্যোগ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিলে খুলে যাবে এতদঅঞ্চলের অপার সম্ভাবনার দুয়ার।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে হাওরের কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন—

হাওর অঞ্চলের কৃষি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেকটা ভিন্নতর। হঠাৎ পাহাড়ি ঢল এবং অতি বৃষ্টিজনিত বন্যা আসার পূর্বে বোরো ধান সংগ্রহ ছিল এই অঞ্চলের কৃষির প্রধানতম সমস্যা। এছাড়া হাওর অঞ্চলে শ্রমিক সংকট নিরসনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই এহেন পরিস্থিতিতে যদি ফসল রোপণ, কাটা ও তোলার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার করা যায় তবে এই সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে।

বিষয়টি আমলে নিয়ে হাওরের কৃষিকে টেকসই করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বর্তমান সরকার বেশকিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রচলিত শ্রমিকের মাধ্যমে পরিচালিত ফসল রোপণ, কর্তন, মাড়াই এবং নির্বিঘ্নে ঘরে তোলার মতো কৃষিকাজ প্রতিস্থাপিত করার লক্ষ্যে শক্তিচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে এখন সরকার সারাদেশে ৫০ শতাংশ এবং হাওর ও উপকূল এলাকায় ৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিচ্ছে।

যন্ত্রপাতির দাম একটু বেশি হওয়ার কারণে সরকার ঋণ সুবিধাও সম্প্রসারণ করেছে-যাতে কৃষকরা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সহজে তা কিনতে পারে। ফলে ৩ বছরে শুধু ধান কাটতে কম্বাইন হারভেষ্টারের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ২০০০ শতাংশ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে গত বোরো মৌসুমে নেত্রকোনায় ৭১ শতাংশ, ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় ৬০ শতাংশ, হবিগঞ্জে ৫২ শতাংশ, মৌলভীবাজারে ৫০ শতাংশ এবং সুনামগঞ্জে ৪১ শতাংশ জমির ধান কম্বাইন হারভেষ্টার দিয়ে কাটা হয়েছে, যা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের বোরো ধান উৎপাদনে শ্রমিকের যে সংকট রয়েছে, তা অনেকটা কেটে যাচ্ছে এবং সময়মতো সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে বলে উৎপাদিত ধান নষ্টও হচ্ছে না।

আর যন্ত্রের ব্যবহারে খরচ কম হওয়ায় কৃষকও ধান উৎপাদন করে ভালো দাম পাচ্ছেন। পাশাপাশি কৃষির একেকটি যন্ত্র একেকজন কৃষককে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলেছে। এভাবে সরকারের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি হাওর অঞ্চলের কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকের জীবনমান বৃদ্ধিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে ক্রমেই হাওর কৃষিতে বাড়ছে ঝুঁকি। এইসব ঝুঁকি মোকাবিলা করে কৃষিকে লাভজনক করতে কৃষি কাজের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি। কৃষি কাজের আধুনিকীকরণ অনেকাংশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ওপর নির্ভরশীল যা কৃষি

ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন নিয়ে হাওর উন্নয়ন বোর্ডের গোড়াপত্তন করেছিলেন তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনারবাংলা বিনির্মাণে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছেন।

হাওরে সমন্বিত কৃষির যান্ত্রিকীকরণকে এগিয়ে নিতে এবং কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দ করেছেন। এইসব কর্মসূচিতে সরকার যে টাকা দিচ্ছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

স্থানীয় পর্যায়ে কৃষিযন্ত্রপাতিসমূহ মেরামতের জন্য প্রশিক্ষিত সার্ভিস প্রোভাইডার তৈরি কৃষিযান্ত্রিকীকরণকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রয়োজনে তাদের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

সর্বোপরি, হাওরের স্থিতিশীল ইকোসিস্টেমকে ব্যাহত না করে বর্তমান সরকারের পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হাওর কৃষিকে লাভজনক, বানিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে কৃষিসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

লেখক: পরিচালক, আইকিএসি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

তৈরি পোশাক: লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকা হতে পারে বড় বাজার

ইউরোপ, আমেরিকায় যখন তৈরি পোশাক শিল্পের বাজার নানামুখি বাধার মুখে পড়ছে, ঠিক তখন আশার আলো দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চীন, জামান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া,

সংযুক্ত আরব আমিরাত, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, লাতিন আমেরিকার মেক্সিকো, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। এটা দেশের পোশাক শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় এবং দারুণ আশার খবর। নতুন এই বাজারগুলোতে বলা হয়ে থাকে অপ্রচলিত বাজার। এর কারণ এসব বাজারে ইউরোপ, আমেরিকা বা কানাডার মত ব্যাপকহারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়না। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের নতুন বাজারে অবশ্যই জোরালো ও তৎপরতা চালাতে হবে। যাতে করে নতুন এসব বাজার বাংলাদেশের পোশাকের দখলে আসে। নিশ্চয়ই তৈরি পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা এবং সরকার নিয়ে ভাবছে। যদি তৈরি পোশাকের নতুন বাজার সৃষ্টি করা যায় এবং যেসব দেশে ইতিমধ্যে নতুন করে বাজার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে ধরে রাখতে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচলিত বাজার অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর উপর অতি নির্ভরতা কমিয়ে আনা যাবে।

বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। এই অবস্থায় কোনো কোনো বিশেষ দেশের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নতুন বাজার খুঁজে বের করা দেশের তৈরি পোশাক শিল্পখাতের জন্য জরুরি বলে মনে করেন এ খাতের বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ২০৩০ সাল নাগাদ পোশাক খাতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে দশ হাজার কোটি ডলার। আর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)তথ্য অনুযায়ি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে ৪ হাজার ৬৯৯ কোটি ডলার। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ অর্থবছরে অপ্রচলিত বাজারে ৮দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। যা ২০২২ অর্থবছরের ৬দশমিক৩৭ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৩১.৩৮% বেশি। এটি আশার কথা। তবে তৈরি পোশাক রপ্তারিন যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছাতে হলে আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। সেজন্যই নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করা এবং সেগুলোকে ধরে রাখার জন্য কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। আশার কথা হচ্ছে, এই যে অপ্রচলিত নতুন বাজার, তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয়ের মোট ১৭.৮২% এসেছে কিন্তু সেই বাজার থেকে। অপ্রচলিত বাজার তৈরি পোশাক শিল্প থেকে একশ বিলিয়ন ডলার অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রার কথা বিজিএমইএ বলছে, সেটা অর্জন করতে হলে অবশ্যই একটা রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। এছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছা খুবই কঠিন কাজ হবে। যতদূর জানি বিজিএমইএ

সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কোন বিকল্পও নেই। কারণ ইউরোপ, অ্যামেরিকা বা ব্রিটেনে আমাদের তৈরি পোশাকের অর্ডার কমছে। তাই নতুন বাজার খুঁজে বের করা ও নতুন বাজারের চিন্তা করাটা খুবই জরুরি। সেই চিন্তা থেকেই মূলত জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো খুঁজে বের করেছেন বিজিএমইএ নেতারা। এসব দেশে এখন তৈরি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে এবং সেটা খুবই ইতিবাচক।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ি, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অপ্রচলিত বাজারে ৮দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ছিলো ৬দশমিক৩৭ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ আগের বছরের চেয়ে ২০২৩ অর্থবছরে ৩১দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয়ের মোট ১৭ দশমিক ৮২শতাংশ এসেছে অপ্রচলিত বাজার থেকে। আবার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত থেকে মোট আয় হয়েছিল ৪৬ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলার। আগের ছিলো অর্থবছরে এই আয় ছিলো ৪২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ১০দশমিক ২৭শতাংশ বেশি।
আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য আশার কথা হচ্ছে, অপ্রচলিত বা নতুন বাজারের তিন দেশ অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ভারতে পণ্য রপ্তানি ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে।এই তিনটি দেশেই নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন বাজারের শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে জাপানে ১৬০ কোটি ডলার, অস্ট্রেলিয়ায় ১১৬ কোটি ডলার, ভারতে ১০১ কোটি ডলার, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫৪ কোটি ডলার ও রাশিয়ায় ৪৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। সব মিলিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ১৮ শতাংশের গন্তব্যই হচ্ছে এখন নতুন বাজার।

এই যে বাজার সৃষ্টি হলো এটিকে ধরে রাখতে অবশ্যই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদেরকে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে পণ্যেল মান নিশ্চিত করতে হবে। কোনোভাবেই যেন নতুন সৃষ্টি হওয়া বাজার থেকে পণ্যের গুণগত মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন না উঠে। মনে রাখতে হবে, নতুন এই বাজার ঠিকটাক মতো ধরে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে এই বাজারই হবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য ‘সোনার ডিম’ পাড়া হাঁসের মতো। সুতরাং এই বাজার ধরে রাখতে সর্বোচ্চ গুরুত্ত্ব দিতে হবে। যদি কোনো কারণে কোয়ালিটি নিশ্চিতে কোনো রকম ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে নতুন বাজারের ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিবে।
একই সঙ্গে এই বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকাকেও টার্গেট করে এগুতে হবে। প্রতিযোগিতার বাজারে নতুন

গন্তব্য খোঁজার কোনো বিকল্প নেই। সামনে নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ আসবে। একদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, নতুন করে শুরু হওয়া ইসরায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে টালমাটাল করে দিচ্ছে। ইউরোপের অনেক দেশই আজ অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে। আমেরিকাতেও অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হচ্ছে। এই অবস্থায় ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা কানাডার মুখাপেক্ষি না থেকে সামনের দিনগুলোতে কিভাবে আরও নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করা যায় বিশেষ করে আফ্রিকা ও মধ্যপাচ্যের দেশগুলোতে সে লক্ষ্যে জোরালোভাবে কাজ করতে হবে। শুধু বিজিএমইএ নয়, সেসব দেশে বাংলাদেশের যে দূতাবাস আছে সেগুলোকেও কাজে লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব সময় উদার ও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

এখন বিজিএমইএ- কে আফিক্রা ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলো যাচাইবাছাই করে সে সব বাজারে কী ধরনের পোশাকের চাহিদা বেশি, কোন মৌসুমে কী ধরনের পোশাকের চাহিদা এগুলো মাথায় রেখে বাজার সৃষ্টিতে মনোযোগি হতে হবে। তাহলেই আগামীতে এসব অপ্রচলিত বাজারের রপ্তানি আরও বাড়বে নিঃসন্দেহে।

আমরা যদি লাতিন আমেরিকার দিকে তাকাই তাহলে সেখানেও বাংলাদেশি তৈরি পোশাক শিল্পের বাজার সৃষ্টির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে মেক্সিকো, ব্রাজিলের মতো দেশ আমাদের তৈরি পোশাক নিচ্ছে। এই দুই দেশের পাশাপাশি লাতিনের অন্যদশেগুলোতেও তৎপরতা চালানো যেতে পারে নতুন বাজার সৃষ্টির। আমাদের ব্যবসায়ীরাও বলছেন, লাতিন আমেরিকা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের জন্য একটি বড় বাজার। এর কারণ বাংলাদেশের পোশাক ব্যবসায়ীরা তাদের ফ্যাশন ও স্টাইলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পণ্য সরবরাহ করতে পারে। এটা খুবই ইতিবাচক খবর। তাই ব্যবসায়ী ও সরকার উভয়েই যদি শক্ত হাতে লাতিনের এই বাজারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন তাহলে লাতিনের দেশগুলো বাংলাদেশের বড় ক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমার মনে হয়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৬২১দশমিক ২৭ মিলিয়ন ডলারের। ২০২১-২২ অর্থবছরে যা ছিল ৫১৫দশমিক ৫০ মিলিয়ন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে রপ্তানি আয় এসেছে ১০৭দশমিক ৭৫ মিলিয়ন ডলার। লাতিন আমেরিকায় ২৫টির বেশি দেশের ৬৬ কোটি ভোক্তার বাজারকে দখলে নিতে পারলে বাংলাদেশের রপ্তানি পোশাক শিল্পের ব্যবসায়ীদের আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। এ জন্য

অবশ্য সরকারকেও আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। লাতিনের যেসব দেশের সঙ্গে এখনও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেনি সেগুরোর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সেইসব দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে যেমন খুলতে হবে, তেমনি সেই সব দেশেও বাংলাদেশের দূতাবাস বা মিশন খুলে বাংলাদেশের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

বাংলাদেশে মানবাধিকার চর্চা এবং ইইউ’র তথাকথিত মানবাধিকার শিক্ষা

নিজ ঘর না সামলে আজকাল পশ্চিমার যেভাবে আমাদের রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা এবং মানবাধিকার ইস্যুতে একের পর এক হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে এর নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের নিজ দেশের কিছু মানুষ এবং সুবিধাভোগী চক্র বিদেশি শক্তিগুলোকে এ ধরণের সুযোগ করে দিচ্ছেন। আজ কথা বলছি তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন ‘অধিকার’ এর অন্যতম কর্তাব্যক্তি আদিলুর রহমানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি বিচারিক আদালত কর্তৃক শাস্তি এবং এ বিষয় নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ)-র পার্লামেন্টে পাশকৃত প্রস্তাব, যেখানে তারা আমাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মজার বিষয় হচ্ছে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন খোদ ইইউ পার্লামেন্ট সদস্য ম্যাক্সিমিলিয়ন ক্রাহ। সুযোগ পেলেই পশ্চিমারা আমাদের মাননাধিকার শেখাতে আসে এবং এটিকে আমাদের সাহায্যের বিনিময়ে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

তাদের এই তথাকথিত মানবাধিকার চর্চার বিষয়টি কতটুকু স্ববিরোধী এর সর্বসাম্প্রতিক উদাহারণ হচ্ছে ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যকার চলমান সংঘাতে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী (সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থনে) কর্তৃক গাজা উপত্যকায় জাতিগত ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত বিষয়ে কোন কথা ইইউ-র কাছ থেকে এখন

পর্যন্ত শুনিনি। প্রকারান্তরে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের গতিবিধি দিয়েই কিন্তু তাদের মানসিকতাকে যাচাই করতে পারছি। সেই সাথে দশকের পর দশক ধরে চলমান ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতে পশ্চিমারা সরাসরি ইসরাইলের পক্ষ্যেই তাদের অবস্থান ব্যক্ত করে আসছে।

বাংলাদেশে ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর মতিঝিলে হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক সাধিত তাণ্ডবে সরকারের তরফ থেকে যে ভূমিকা নেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে সরকার ভুলটি কোথায় করেছে, সেই প্রশ্নে না গিয়ে গুজব সৃষ্টিকারী কিছু ব্যক্তির পক্ষ্যে সরাসরি অবস্থান নিয়ে তারা আসলে আমাদের দেশকে নিয়ে কি ভাবছে এবং কোন পর্যায়ে টেনে নামাতে চাইছে-বিষয়টি কিন্তু গভীর উদ্বেগের। আমরা যদি পাল্টা আমাদের দিক থেকে তাদের উল্টো জিজ্ঞেস করি, পশ্চিমা কোন দেশের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে যদি কোন অপশক্তি সাধারণ জনগণের অধিকারের বিপরীতে কাজ করে তাহলে সেদেশ বা দেশগুলোর সরকার কি করে থাকে? আমরা এরকম অনেক দেখেছি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্যসহ অনেক ইউরোপীয় দেশে তাদের ভাষায় বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসী হামলার বিপরীতে বন্দুক যুদ্ধের মাধ্যমে কখনও হামলাকারীদের পাকরাও আবার কখনও হত্যার ঘটনা ঘটানো হয়। কিছুদিন আগেও ফ্রান্সে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক হত্যা নিয়ে ব্যাপক বিদ্রোহ হয়েছে। দেশটির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময় সংখ্যালঘু মুসলিম এবং কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যের জবাবে কি আমরা কখনো ইইউর মানবাধিকার কমিশনকে সচেতনভাবে কোন ভূমিকা নিতে দেখেছি? দেখিনি।

বাংলাদেশের বিচারিক আদালতের রায়ে যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদন্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তার অপরাধের মাত্রাটুকু যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি তাহলেই বুঝতে পারব পশ্চিমা ইইউ কর্তৃক এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কতটা অশোভন। ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশের সময় তারা যে ধরণের নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল, এতে করে পুরো ঢাকা প্রায় অচল হবার অবস্থা হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে বারবার তাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সভা সমাবেশ এবং যৌক্তিক পন্থায় তাদের দাবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জনজীবনে আতংক সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে বলা হলেও তারা সেবিষয়ে কর্ণপাত করেনি। সবশেষে জনস্বার্থে পুলিশী অভিযানের মধ্য দিয়ে ১৩ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেলেও অধিকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় ব্যাপক অভিযানে ৬৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তীতে দেখা যায়, তাদের দাবি করা অনেকেই স্ব স্ব কর্মস্থলে চাকরি করছেন। সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের তালিকা

চেয়ে অধিকারকে চিঠি দেয়া হলে সেই চিঠিকে গ্রাহ্য করেনি তারা। এর মধ্য দিয়ে এটাই মনে হওয়া প্রাসঙ্গিক যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে উস্কানী দেয়ার মাধ্যমে দেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে তারা সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করতে চেয়েছে। এর পদক্ষেপ হিসেবে মামলা এবং ১০ বছরের বেশি সময় পর রায় হলে অধিকার সম্পাদক আদিলুর রহমান এবং পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানকে ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তারা যদি তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাদের দাবি অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা প্রমাণ করতে পারতেন তাহলে তো আর মামলার কোন আবশ্যকতা থাকতনা। নিছক গুজব ছড়িয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দেশের কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে তারা ছেলেখেলায় মেতে উঠেছিলেন। এর পেছনে দেশীয় অপশক্তির মদদের সাথে বিদেশী শক্তির উস্কানী সমন্বিতভাবে কাজ করেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা। আর এটা করতে পারলে এখানে আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মত করে তারা তাদের স্বার্থকে চরিতার্থ করতে পারবে। যে বিষয়টি তাদের নিজের দেশের ক্ষেত্রেও অমার্জনীয় অপরাধের পর্যায়ে পরে, সেখানে আমাদের আদালতের রায়কে নিয়ে কটাক্ষ করা এবং বাতিলের দাবী করা এবং এটিকে মানবাধিকার পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদাকে ভুলন্ঠিত করার চেষ্টা বৈ অন্য কিছু নয়।

ইইউ-র সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া এবং আমাদের রাজনীতিতে তারাসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানাবিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে হস্তক্ষেপ করতে চাওয়ার প্রয়াস একই সূত্রে গাঁথা। একটি দেশের আদালতের রায় নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে তারা কোন ধরণের মানবাধিকারের চর্চা করতে চেয়েছেন সেটা এক বড় প্রশ্ন। তথাকথিত কিছু মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশের ১৭ কোটির অধিক মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং চর্চায় কাজ করছে নাকি এর নাম নিয়ে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হয়ে বিদেশীদের কাছে ধর্না দিচ্ছে বিষয়টি আজ সচেতন মহলের জন্য ভাবনার বিষয়।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফিলিস্তিনিদের দুঃখে পাশে আছে বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আরব রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানের সঙ্গে ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানকে তারা সহায়তা দিয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি খুব দরকার ছিল। ওই সময় অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেই স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করে। এটা ছিল সদ্য স্বাধীনতা একটি দেশের জন্যে খুবই সাহসী সিদ্ধান্ত। তবু কাজটি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

আজও বাংলাদেশ ফিলিস্তিন ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্র নীতিতে অটল। শেখ হাসিনার সরকার বিশ্বাস করে, বাংলাদেশ সবসময় মানবাধিকার ও মানবিকতারে পক্ষে। এটা শুধু সহিংসতা, দখলদারি, ফিলিস্তিন বা মুসলিম সম্পর্কিত বিষয় নয়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সংগ্রামরত মানুষকে সব সময় সমর্থন দিয়েছেন। তাই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান ও দ্বিরাষ্ট্র নীতির ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও টেকসই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির পক্ষে উচ্চকিত ছিলেন তিনি।

এরই ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার রক্ষায় এবং জাতিসংঘ প্রস্তাব, আরব পিস ইনিশিয়েটিভ ও কোয়ার্টেট রোডম্যাপের আলোকে স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিলিস্তিন সংকটের একটি টেকসই এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

সম্প্রতি সংঘটিত সকল ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতে এবং যেকোনো সংকট নিরসনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপে ফিলিস্তিনের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে বাংলাদেশ। অনেক মুসলিম দেশ এরইমধ্যে ফিলিস্তিনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিংবা গোপনে ইসরায়েলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ বিশ্বাসভঙ্গ কিংবা কোনো ভান-ভনিতার আশ্রয় নেয়নি। স্বাধীনতার পর

থেকেই বাংলাদেশ ইসরায়েলি দখলদারি ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে অটল রয়েছে।

ঐতিহাসিক ভাবে বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । এখানে ১৯৭২ সালে ইসরায়েলের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি আরও একবার উল্লেখ করতে হবে। কারণ ওই সময় ইসরায়েলের স্বীকৃতি এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্যে সহজ ছিলও না। তবু বাংলাদেশে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি জোরালো সমর্থন অব্যাহত রাখতে এবং মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি হোক এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে ইসরায়েলের স্বীকৃতি গ্রহণ করেনি। তাই ওই সময় থেকে ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারির অবসান ঘটিয়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনকে সমর্থন করা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অতিগুরুত্বপূর্ণ নীতি।
আরব দেশগুলোর বেশির ভাগই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। কিন্তু তখনও ফিলিস্তিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে। ১৯৬৭ সালের নির্ধারিত সীমানা অনুযায়ী জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে সমর্থন করে বাংলাদেশ।

ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯৭৪ সালে লাহোরে ওআইসির দ্বিতীয় সম্মেলনের সময় ইয়াসির আরাফাত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে প্রথম উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তার প্রথম ভাষণে, ১৯৭৪ সালে ওআইসির দ্বিতীয় সম্মেলনে এবং ১৯৭৩ সালে চতুর্থ ন্যাম সম্মেলনে ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রাম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ফিলিস্তিনকে সমর্থন করে মেডিক্যাল টিম ও ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সহায়তা করে। ঢাকায় প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-এর কার্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও পিএলওর মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি ফিলিস্তিনে, পবিত্র আল-আকসার জন্য সশরীরে লড়াই করেছে। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের লাইব্রেরির ১৯৮৮

সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, ১৯৮৭ সালে প্রায় আট হাজার বাংলাদেশি যুবক পিএলওতে যোগ দিয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে লড়াই করেছে। ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণার পর থেকে জাতিসংঘের যে ১৩৮টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ তার অন্যতম। ১৯৮০ সালে একজন ফিলিস্তিনি যোদ্ধার ছবিসংবলিত ডাকটিকিটও প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ যেমন ইসরায়েলের স্বীকৃতি গ্রহণ করেনি তেমনি গত ৫০ বছরে ইসরায়েলকেও বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয়নি। উপরন্তু, বাংলাদেশি নাগরিকদের ইসরায়েল ভ্রমণে সরকারি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে সব রকম বাণিজ্য (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ইসরায়েলের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্কও নেই।

এখনও বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের সাথে ফিলিস্তিনের জনগন ও সরকারের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ফিলিস্তিনি ছাত্রদের বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ফিলিস্তিনের সামরিক সদস্যদের বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সামরিক সম্পর্কও তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ক্রমাগত ও জোরালো সমর্থক এবং ইসরায়েলের দখলদারির বিরোধিতাকারী। এরই ধারাবাহিকতায় ইসরায়েলের চলমান বর্বরোচিত আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখিতভাবে প্রতিবাদ করেছেন। বর্তমানে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার বিষয়টি সুরাহা করতে বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ২০২১ সালে ইসরায়েলি হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়ে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসকে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চিঠিতে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি আল-আকসা মসজিদ কমপ্লেক্সে নিরীহ মুসলমান এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার গভীর দুঃখ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করছি।’ ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বের যেসব স্থানে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো বন্ধে টেকসই ব্যবস্থা নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি।

শেখ জাররাহ এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে ইসরাইলের দখলের

প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করে সেই এলাকা দখল করে ইসরাইলি বাহিনী মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন করেছে’। চিঠিতে ফিলিস্তিনের রাজধানী পূর্ব জেরুজালেমসহ ১৯৬৭ সালের সীমান্তের ওপর ভিত্তি করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানও পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে ২০২০ সালে এবং পরে ২০২২ সালেও একই ভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন চিঠি দিয়েছিলেন। গত পাঁচ দশক ধরে ফিলিস্তিনের বেশ কয়েকটি অঞ্চল দখল করে রেখেছে ইসরায়েল। যে কারণে ইসরায়েলকে কি ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের (আইজিসে) মতামত জানতে জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। এই প্রস্তাবের পক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশ ভোট দিয়েছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর আইএমএফ ঋণের সম্ভাব্য প্রভাব

এই নিবন্ধটি রচনার শুরুতে আমি একটি বিষয় পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করতে চাই যে আমি পেশায় একজন অর্থনীতিবিদ নই। তবে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আইএমএফ ঋণের সম্ভাব্য প্রভাবকে ঘিরে চলমান আলোচনায় লোক প্রশাসনের একজন শিক্ষক হিসেবে আমার উপলব্ধিতি এই নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং বৈদেশিক রিজার্ভ বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (এইএমএফ) থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমান ঋণ পেয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দেশের জন্য অনেক ইতিবাচক প্রভাবের সূচনা করবে একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় কারন এই ঋণ দেশ বর্তমানে যে আর্থিক চাপের মধ্যে রয়েছে তা

কমাতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক চাপের কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ কমে যাচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষ থেকে সমালোচনা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় এইএমএফ এর সহায়তা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লাইফলাইন বলে গণ্য হবে। এই ঋণ সহায়তা শুধুমাত্র দেশের আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে না, বরং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও শক্তিশালী করবে।

বাংলাদেশকে এইএমএফ এর আর্থিক সহায়তা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসেছে যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অর্থনীতি সমস্যা মোকাবিলা করতে এইএমএফ সহায়তা চেয়ে পাচ্ছে না। ফলে এই ঋণ সুবিধা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রেরণা প্রদান করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এইএমএফ ঋণের ইতিবাচক প্রভাবের কিছু মূল দিক উল্লেখ করা হল।

আইএমএফ ঋণের সবচেয়ে তাৎক্ষণিক এবং আপাত সুবিধাগুলোর একটি হলো বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর এই ঋণের ইতিবাচক প্রভাব। এই বর্ধিত রিজার্ভ আমদানির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে, বৈদেশিক ঋণের কিস্তি প্রদান করতে এবং অর্থনৈতিক ধাক্কা মোকাবিলার জন্য অপরিহার্য। আইএমএফ ঋণ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় দেশের ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে।

এই ঋণ সহায়তা দেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এক ধরনের আস্থার পরিবেশ তৈরি করবে। এই সহায়তা বাংলাদেশকে আরও আকর্ষণীয় বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং প্রতিশ্রুতিশীল কাজের সুযোগ তৈরি করবে। বিশ্ব যখন কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের চলমান প্রভাব মোকাবিলা করছে, আইএমএফ ঋণ এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে সহায়তা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ফলে, এটা স্পষ্ট করে বলা যায় যে এইএমএফ ঋণ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বহুমুখী ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে যা তাৎক্ষণিক আর্থিক সমস্যা মোকাবিলা করতে সরকারকে সহায়তা করবে।

এইএমএফ ঋণ দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতার মুখে একটি স্থিতিশীল শক্তি হিসাবে কাজ করবে। এটি অর্থ প্রদানের ভারসাম্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করবে এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন, মুদ্রাস্ফীতি এবং আর্থিক অস্থিতিশীলতার সম্ভাবনা হ্রাস করবে। এই স্থিতিশীলতা

বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের স্থান নির্বাচন করার সময় সময় প্রায়ই শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ গন্তব্যগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আইএমএফ এর সাম্প্রতিক ঋণ প্রদান একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে, যা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করবে এবং রাজস্ব দায়িত্বের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকে তরান্বিত করবে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সঞ্চারিত এই নতুন আস্থা বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহকে শুধু পুনরুজ্জীবিতই করবে না, বরং এটিকে বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগের (এফডিআই) জন্য আরও প্রলোভনশীল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। দেশে এফডিআই এর প্রবাহ বেশি হলে তা কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে যা বেকারত্ব হ্রাস এবং জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া, বিদেশী বিনিয়োগ প্রায়শই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং শিল্পের সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে সংযুক্ত, যা দেশের শিল্প ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখবে। আইএমএফ ঋণ এবং বিদেশী বিনিয়োগের মধ্যে এই সমন্বয় আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

এইএমএফ ঋণ সহায়তা একটি দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নীতিগত শর্তগুলির একটি সেট নিয়ে আসে। এই সংস্কারগুলি সরকারী ব্যয় অপ্টিমাইজ করতে, শাসন ব্যবস্থার উন্নতি এবং ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে। আইএমএফ চুক্তির অংশ হিসেবে, বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করবে এমন কাঠামোগত সংস্কার গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

কোভিড-১৯ অতিমারি পরবর্তী রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ প্রভাব দ্বারা সৃষ্ট আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। ফলে, এই প্রেক্ষিতে, এইএমএফ ঋণ শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সহায়তাই করবে না, বরং চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টাকে সহজতর করবে। অতিমারি দ্বারা সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা থেকে দেশকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এই ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে এইএমএফ এর ঋণ নিয়ে বিভিন্ন সমালচনা থাকলেও বাংলাদেশের জন্য এই ঋণ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ঋণ বৈদেশিক রিজার্ভ সংক্রান্ত শঙ্কা কাটিয়ে উঠতে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা জাগ্রত করতে, প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কার নিশ্চিত করতে এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব মোকাবিলার করতে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, এই আর্থিক সহায়তা দেশের অর্থনৈতিক গতিপথ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

লেখক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর।

পর্যটনে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ

বিলম্বে হলেও আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৬৪ জেলাকে রেল নেটওয়ার্কে আওতায় আনতে কাজ শুরু করেছে সরকার। অথচ দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ও পুরনো যোগাযোগ মাধ্যম হলো রেলপথ। ১৯৬২ সালে ব্রিটিশ আমল থেকেই এ অঞ্চলে রেল যোগাযোগ শুরু হয়। এতোদিনেও সকল জেলায় রেল লাইন হয়নি, যা সত্যিই বিস্ময়ের। তবুও পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্প উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ৪৩ থেকে ৪৭ জেলা রেল যোগাযোগে যুক্ত হয়েছে।

আগামী ১২ নভেম্বর দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। এরমধ্য দিয়ে রেল যোগাযোগে আরেকটি মাইল ফলক অর্জনের পথে বাংলাদেশ। সরকারের ফাস্টট্র্যাক প্রকল্পের একটি চট্টগ্রামের দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ। এর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পর্যটন নগরী কক্সবাজারও আসছে রেল যোগাযোগের আওতায়। ঢাকা থেকে সরাসরি ট্রেনযোগে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত দেখতে যেতে পারবেন পর্যটকরা। যা সত্যিই আনন্দের খবর।

শুধু কি তাই? এ প্রকল্প চালুর মধ্য দিয়ে গোটা কক্সবাজারের অর্থনীতিতে আরো বেশি গতি ফিরবে। কারণ পর্যটক আগের চেয়ে অনেক বাড়বে। তেমনি তৈরি হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ। কারণ এখানে শুধু সমুদ্র সৈকত আছে তা নয়, অন্তত ১৫টি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে জেলাজুড়ে। এর সবকটিতেই পর্যটক উপস্থিতি বাড়বে, তা নিঃস্বন্দেহে বলা যেতে পারে। এই সুযোগটিকে সরকার কতোটুকু কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে তাই দেখার বিষয়।

কক্সবাজারের প্রাচীন নাম পালংকী। একসময় এটি প্যানোয়া নামে পরিচিত ছিল। প্যানোয়া শব্দটির অর্থ ‘হলুদ ফুল’। অতীতে কক্সবাজারের আশপাশের এলাকাগুলো এই হলুদ ফুলে ঝকমক করত। এটি চট্টগ্রাম থেকে ১৫৯ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এ জেলায় রয়েছে প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন। সমুদ্র সৈকতের চেয়ে এ দ্বীপের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ অনেকগুন। এর বাইরে রাবার বাগান, সোনাদিয়া দ্বীপ, রামকোট সহ বেশ কয়েকটি বড় ও আকর্ষণীয় বৌদ্ধ বিহার। পাশাপাশি হিমছড়ি, রাবার স্টেশন, ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক, মহেশখালী জেটি, কুতুবদিয়া বাতিঘর, আদিনাথ মন্দির, অজ্ঞামেবী ক্যং প্রভৃতি পর্যটন কেন্দ্র পর্যটকদের তালিকায় এগিয়ে। রেলপথ চালুর পর এর সবকটিতেই কমবেশি পর্যটক বাড়বে। এর বড় কারণ হলো, ট্রেন যাত্রা অনেকটাই আরামদায়ক। ভাড়া বিবেচনায় আকাশ ও সড়ক পথের চেয়েও অনেকক্ষেত্রে সাশ্রয়ি।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৫১টি দেশের পর্যটকরা বাংলাদেশে ভ্রমণ করবেন, যা মোট জিডিপিতে ১০ শতাংশ অবদান রাখবে। পর্যটনশিল্পের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার রোল মডেল। পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) হিসাব অনুযায়ী, বছরে এখন ৫০ থেকে ৬০ লাখ মানুষ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যান। বছর পাঁচেক আগেও এ সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ লাখ ছিল।

ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৪০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে দেশের পর্যটন খাত। আর্থিক মূল্যে দেশীয় পর্যটন খাতের আকার দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৪ হাজার কোটি টাকার। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় ২০ লাখ পর্যটককে আতিথেয়তা দেয় কক্সবাজার। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় দুই শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের মধ্যে পর্যটনশিল্পের সর্বোচ্চ

বিকাশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। পুরো দেশকে আটটি পর্যটন জোনে ভাগ করে প্রতিটি স্তরে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রথমবারের মতো সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসাবে কক্সবাজারে পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণে ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলোয় প্রায় প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ হবে ৩৭ হাজার কোটি টাকা। পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ হবে ১ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা।

মূলত পর্যটকদের সুবিধার্থে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ করছে রেলপথ মন্ত্রণালয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, জেলা শহর থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে ঝিলংজা ইউনিয়নের হাজিপাড়া এলাকায় ২৯ একর জমির ওপর দৃশ্যমান আইকনিক রেল স্টেশন। ঝিনুকের আদলে তৈরি দৃষ্টিনন্দন এ স্টেশন ভবনটির আয়তন এক লক্ষ ৮২ হাজার বর্গফুট। ছয়তলা বিশিষ্ট স্টেশনটি নির্মাণে চীন, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, ইতালিসহ বিশ্বের বিভিন্ন আধুনিক স্টেশনের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। পুরো প্রকল্পটিতে ১১০ জন বিদেশিসহ মোট ২৫০ জন প্রকৌশলী এবং ছয় শতাধিক লোক কাজ করছে। চার বছরের শ্রমে আইকনিক রেলস্টেশন ভবনটি আজ সত্যিই চোখ জুড়ানো বাস্তবতা।

এশিয়ার প্রথম শতভাগ পর্যটনবান্ধব কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টেশনে রয়েছে পর্যটকদের জন্য সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা। পর্যটকরা যেন কক্সবাজারে দিনে এসে ঘুরে আবার ফিরে যেতে পারেন, সে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। স্টেশনে থাকবে লাগেজ ও লকার সিস্টেম। থাকছে আধুনিক ট্রাফিক সুবিধা। নিচতলায় টিকেট কাউন্টার, অভ্যর্থনা কেন্দ্র। দ্বিতীয়তলায় শপিংমল ও রেস্তোরাঁ। তিন তলায় তারকা মানের হোটেল। থাকছে মসজিদ, শিশু যত্ন কেন্দ্র ও চলন্ত সিঁড়ি। এখনে থাকছে এটিএম বুথ, পোস্ট অফিস, ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন বুথসহ নানা সেবা কেন্দ্র।

চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার রেলপথটি দুটি ভাগে কাজ করছে ঠিকাদার। দোহাজারী থেকে চকরিয়া অংশের কাজ করছে সিআরইসি এবং তমা কনস্ট্রাকশন। আর চকরিয়া থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত অংশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিসিইসিসি এবং ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার। ২০১৬ সালের ২৭ এপ্রিল প্রকল্পটি ফাস্টট্র্যাকভুক্ত হয়। ২০১০ এর জুলাই থেকে শুরু হয়ে আগামী বছরের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ রয়েছে।
চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথে ঢাকা থেকে

দিনে দুটি ট্রেন চালানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বলা হয়েছে- একটি ট্রেন সকাল সোয়া আটটায় ঢাকার কমলাপুর থেকে যাত্রা করে দুপুর সোয়া দুইটায় কক্সবাজারে পৌঁছাবে। ওই ট্রেনটি কক্সবাজার থেকে রাত সাড়ে সাতটায় যাত্রা করে কমলাপুর পৌঁছাবে ভোর তিনটা ৪০ মিনিটে। আরেকটি ট্রেন কমলাপুর থেকে রাত সাড়ে ১০টায় যাত্রা করে সকাল সাড়ে ছয়টায় পৌঁছাবে কক্সবাজারে। সেখান থেকে দুপুর ১২টায় ফিরতি যাত্রা করে কমলাপুরে ফিরবে রাত আটটায়।

সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৮ হাজার ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ। এটি ট্রেন চলাচল শুরু করার ক্ষেত্রে তেমন একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বন্যায় ক্ষতি হওয়া লাইনের মেরামত ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।

পর্যটনশিল্প-বিকাশে অবারিত সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। বিদেশি পর্যটক ছাড়াও দেশের পর্যটকদের নিরাপত্তা, যোগাযোগের সুবিধা ও আকর্ষণীয় অফার দিলে সাগড়কন্যাখ্যাত পর্যটনগরী কক্সবাজারে লোক সমাগম বাড়বে। এক্ষেত্রে স্থানীয় যাতায়াতের সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি আরো কিছু পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।
বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ভাবনার জায়গাটি খুবই দুর্বল বা অবেহেলিত বলা যেতেই পারে। পর্যটনে এগিয়ে যেতে হলে অঞ্চল বা জেলা ধরে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন, কক্সবাজারের পর্যটনসমৃদ্ধ এলাকাগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, পর্যটন এলাকায় পর্যটন পুলিশকেন্দ্র স্থাপন, বিদেশি পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক গাইডের ব্যবস্থা, বিদেশে বাংলাদেশের ট্যুরিজম প্রমোশনে রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারের উদ্যোগী ভ‚মিকা পালন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রচারণা, পর্যটন এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয়সংখ্যক হোটেল নির্মাণ। যেন সাধ্যের মধ্যে পর্যটকরা সব ধরণের হোটেলে থাকার সুযোগ পান। সবশেষে পর্যটনে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় যাত্রা শুরু হোক ঢাকা- চট্টগ্রাম হয়ে দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথের।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

জনস্বাস্থ্যে শেখ হাসিনার অবদান

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাকে আমরা মূলত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এক, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা; দুই, সমসাময়িক কিংবা তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা। এই দুই অংশের সহযাত্রা একটি জাতির জনস্বাস্থ্য খাতকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জনস্বাস্থ্যে গৃহীত পদক্ষেপ গুলি ছিল মূলত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে সেটিই স্বাভাবিক ছিল। বঙ্গবন্ধু, সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সমান প্রাপ্তি এবং বৈষম্য কমাতে স্বাস্থ্য সেবার জাতীয়করণ করেন, যার সুফল ৫০ বছর ধরে এদেশের মানুষ পেয়ে যাচ্ছে। তিনি সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন যা তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো তৈরি, টিকাদান কর্মসূচি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যের লোকবল বৃদ্ধি এবং জরুরী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে একটি দৃষ্টান্তমূলক যাত্রা শুরু করেছিলেন। এ যাত্রার অংশ হিসেবে ১৯৭৪ সালে জনস্বাস্থ্য শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (নিপসম) প্রতিষ্ঠা করেন।

পিতার আদর্শে উদ্ভূত জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৫ বছরে জনস্বাস্থ্য খাতে জাতির পিতার ছায়াকে অনুসরণ করেছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম তাৎপর্যগতভাবে একই সাথে সুদূরপ্রসারী এবং সমসাময়িক। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আদলে তিনি কমিউনিটি ক্লিনিক ধারণা প্রবর্তন করেন যা ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃত সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার অংশ। কমিউনিটি ক্লিনিক একটি জনমুখী স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা এবং সারাদেশে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রসারিত করাই এর লক্ষ্য। এটি জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এই যুগান্তকারী এবং সুদূরপ্রসারী ধারণার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এবার আসা যাক সমসাময়িক

কিংবা তাৎক্ষণিক জনস্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকার কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ করতে এবং দেশে এর প্রভাব প্রশমিত করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং অবদান রেখেছেন। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে রোল মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচির অসামান্য সাফল্যের জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০১৯ সালে গ্যাভি ভ্যাকসিন হিরো অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছেন। সুতরাং, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক, শিশু টিকাদানের সর্বজনীন কভারেজ এবং কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা ও টিকাদানে সাম্প্রতিক সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে। আর এই স্বীকৃতির রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা।

সামগ্রিক স্যানিটেশন, হাইজিন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিশু ও মাতৃমৃত্যু, এইডস ও ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ অর্জনে শতভাগ সফলতা অর্জন করায়, প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরেই বাংলাদেশ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (এমডিজি) এর লক্ষ্য অর্জন করে। তার হাত ধরেই বাংলাদেশ এখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ২০৩০ সালের ভিতর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) এর লক্ষ্য অর্জনে।

নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ২০ এর কম, শিশু মৃত্যুর হার ২১.৫/১০০০ জীবিত জন্মে এবং ৫ বছরের কম বয়সী মৃত্যুর হার ২২-এ নেমে এসেছে। মাতৃমৃত্যুর অনুপাত ১৭০/১০,০০০-এর কমে নেমে এসেছে। মহিলাদের আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৪.১ বছর এবং পুরুষদের জন্য ৭০.৮ বছর।২০১৩ সালে, বাংলাদেশ এমডিজি লক্ষ্যমাত্রায় ক্ষুধা অর্ধেকে কমানোর জন্য জাতিসংঘের এফএও পুরস্কার পেয়েছে যা দেশের মানুষের পুষ্টির যোগানের স্বয়ংসম্পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। সরকার খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে এবং বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশ ৮৩..৯ শতাংশ বৈধ পূর্ণ টিকা কভারেজ অর্জন করেছে, যা ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভ্যাকসিন হিরো অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করেছে।২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দ্বারা বাংলাদেশ পোলিও-মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। অবহেলিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এবং ম্যালেরিয়া রোগ

কমাতেও বাংলাদেশ সফল হয়েছে। অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বহুক্ষেত্রীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য, অটিজম, এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণে বিগত বছরেরগুলোতে বিশেষ নজর দিয়েছে। প্রতিবন্ধী অধিকার আইন এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটি প্রোটেকশন ট্রাস্ট আইনের মতো আইন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ একজন WHO গুডউইল অ্যাম্বাসেডর এবং অটিজমের জন্য আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন। টেলিমেডিসিন এবং “স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩” কল সেন্টার দেশব্যাপী স্বাস্থ্য সেবা এবং তথ্য প্রদান করে চলেছে। ২০১১ সালে, প্রধানমন্ত্রী আইসিটি ব্যবহার করে স্বাস্থ্য খাতে অগ্রসর হওয়ার জন্য ‘ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট’ গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেনস অ্যাওয়ার্ড পান।

গত দেড় দশকে স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতি হয়েছে সরকারের প্রতিশ্রুতি, নীতি, কৌশল, আইন প্রণয়ন এবং তাদের কার্যকর ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন, প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত ও কার্যকরী সাংগঠনিক নেটওয়ার্কের কারণে। এবং অ-প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্য জনশক্তি, সরকারী, বেসরকারী সংস্থাগুলির সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তা; এবং পরিবার পরিকল্পনা, ইমিউনাইজেশন, ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি, যক্ষ্মা, ভিটামিন-এ সহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে সামগ্রিকভাবে সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য। এ অগ্রগতি গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- স্বাস্থ্য বীমা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীলতা অর্জন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষায়িত ভৌত কাঠামো নির্মাণ। যার পেছনে নিরলস কাজ করে গেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। জনস্বাস্থ্য সহ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত আজ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই উচ্চতা ধারণ করেন বলেই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, “আমি অসুস্থ হলে এই দেশেই চিকিৎসা করো, বিদেশে যাওয়ার দরকার নাই”।

লেখক: অধ্যাপক, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে চীনের রাগ বাংলাদেশের ওপর ঝাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র!

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে এসেছে। সবসময়েই বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। যখনই কোন জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তখনই বাংলাদেশ কোন অবস্থান ব্যক্ত না করে তার পররাষ্ট্রনীতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম বাংলাদেশ অনেকগুলো দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে আছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্র দেশগুলোর ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি।

বলা বাহুল্য, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির পাশাপাশি জিওগ্রাফিক্যাল অবস্থানের জন্য ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটিজিতে দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশপথ হিসাবে কাজ করতে পারে বাংলাদেশ। এমনকি এই অঞ্চলের আরেক শক্তি ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী দেশ হওয়ায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। জনসংখ্যার বিচারেও বাংলাদেশ বড় একটি বাজার। অনেকেই বাংলাদেশের এই বাজারে ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন, বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। আর ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির পর বাংলাদেশ যে বিশাল জলসীমা পেয়েছে, সেখানেও প্রচুর সম্পদ আছে। এসব কারণে বাংলাদেশ এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপানসহ কোয়াডের অন্য সদস্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে ঢাকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়ায় বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই ভারত সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টিত ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে ।

চীন কখন শক্তিশালী হয়ে উঠলো? বলা হয়ে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি বড় ধরণের বাঁক বদল ঘটেছিল ২০১৭ সালে।

সেবছরের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে। ২০১৭ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র যত ধরণের প্রতিরক্ষা, সামরিক বা কূটনৈতিক দলিল প্রকাশ করেছে, তার সব কিছুর কেন্দ্রে আছে চীন । এখন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় মাথাব্যাথা কীভাবে চীনকে ঠেকানো যায়। কীভাবে সেটা করা যাবে? যুক্তরাষ্ট্রের এসব কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি। এই স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইতমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত—এই চার দেশের জোট কোয়াড গঠিত হয়েছে। বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বা বিআরই নামের যে মহা-পরিকল্পনা নিয়ে চীন বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো- প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি ছিল মূলত তার পাল্টা পরিকল্পনা, চীনকে ঠেকানোর কৌশল। ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যত মিত্র দেশ আছে, এই ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিতে তাদেরকে একটি চীন-বিরোধী জোটে জড়ো করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

একটু ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চল ঘুরে দেখা যাক। এই অঞ্চল এর রাজনীতি অর্থনীতি কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ? ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দেশ আছে এক ডজনেরও বেশি। আছে চীন, ভারত, পাকিস্তানের মতো পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। আছে জাপান-কোরিয়ার মতো অর্থনৈতিক শক্তি। ইন্দো- প্যাসিফিক দেশগুলোতে যে জনসংখ্যা সেটা বৈশ্বিক জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি, যার ৫৮ শতাংশই আবার তরুণ। কর্মশক্তি এবং ভোক্তা
- দুই হিসেবেই সংখ্যাটা বিশাল। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক অর্থনীতিরই দুই-তৃতীয়াংশ, জিডিপি’র পরিমাণ হচ্ছে বৈশ্বিক জিডিপি’র ৬০ শতাংশ। ছাড়া বিশ্বে যে সমুদ্র আছে, তার ৬৫ শতাংশ পড়েছে ইন্দো-প্যাসিফিকে, ভূমির ক্ষেত্রে যেটা ২৫ শতাংশ। যার কারণে এই অঞ্চল হয়ে উঠছে বৈশ্বিক রাজনীতির ভরকেন্দ্র এবং আগ্রহের কারণ।

এদিকে ভারতের সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক বিবিসি ও রয়টার্সের সাবেক সংবাদদাতা। গত ৮ অক্টোবর ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ন্যাশনাল হেরাল্ডের অনলাইন সংস্করণে ‘আই অন চায়না, প্রেসার অন বাংলাদেশ: আমেরিকাস লেটেস্ট গ্রেট গেম ইন দ্য ইস্ট’ শিরোনামে এক নিবন্ধে বাংলাদেশের ওপর মার্কিন চাপের অন্তর্নিহিত কারণগুলোকে তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেন এত মাথাব্যথা সেই প্রশ্ন তুলেছেন। ভৌমিক বলেছেন, চীনকে ঘিরে

যুক্তরাষ্ট্র যেসব কৌশল আঁটছে তার মধ্যেই এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের স্থল ও সমুদ্রে প্রবেশের রুটগুলোকে অবরুদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে তারা।

এই যে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের ওপর ক্ষোভ তার কারণ দেশটি এতো স্ট্যাটেজিতে পা দিচ্ছে না বাংলাদেশ। এবং আমেরিকার জন্য বড় চিন্তার হলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি। ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় ইন্দো-প্যাসিফিক এখন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, এই অঞ্চলকে ঘিরেই এখন তীব্র হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে দুই বৃহৎ শক্তিই বাংলাদেশকে তাদের পক্ষে চায় । ২৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি আবারও ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। এই অঞ্চলকে ঘিরে ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী হবে, সেটাই মূলত তুলে ধরা হয়েছে ‘ইন্দো- প্যাসিফিক রূপরেখা’ নামের ওই নীতিতে। “সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়” বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যে মূল ভিত্তি সেটিই তুলে ধরা হয়েছে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল ঘিরে বাংলাদেশের রূপরেখায় ।
আর বিপত্তিটা ঘটলো এখানেই। ফলাফল, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘন, সুষ্ঠু নির্বাচনের অজুহাতে দেশের অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে প্রচ্ছন্নভাবে নানা দিক থেকে চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে বাংলাদেশকে । দীর্ঘবছর ধরেই বাংলাদেশের মানবাধিকার ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের অজুহাতে দেশের প্রতিটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো। কিন্তু তারা অন্য অনেক দেশের কোন লঙ্ঘনকেই যুক্তরাষ্ট্র আমলে নেয় না। ফলে বলাই যায় যে, বাংলাদেশ ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের এত কূটনীতিক তৎপরতার কারণ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল ঘিরে বাংলাদেশের নিরপেক্ষ অবস্থান ঘোষণা দেয়া।

আসলেই চীনকে প্রতিপক্ষ ভেবে কতদূর করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় ৯ অক্টোবর রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত বে অব বেঙ্গল সম্মেলনে ‘ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রতিযোগিতা’ শীর্ষক অধিবেশনে যে কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সেটি থেকেই। তিনি সরাসরি বলেন, ইন্দোপ্যাসেফিক অঞ্চলে ক্রমেই চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অবাধে বাড়তে দিলে তা এ অঞ্চলের দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে। ফলে চীন ঠেকাও যেমন মনোভাবে আছে, সেটা করতে বাংলাদেশকে দুর্বল করে সাথে নেওয়ার কৌশলও বিদ্যমান।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকার

একটি জাতির সামগ্রিক সত্তার পরিচয় তার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে একটি জাতি জাতীয় ও বিশ্ব দরবারে নিজের অবস্থান তৈরি করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাঙালি জাতি আজ বিশ্বের দরবারে তার স্বকীয় উন্নত সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজের অবস্থান তৈরি করেছে। আজ বাঙালি ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের বলিষ্ঠ ও সৃজনশীল নেতৃত্বে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আপামর বাঙালি তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে । এক্ষেত্রেও অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিগত আবেগ। এই সফল্য আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, এমনকি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মতো জীবন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতার ফল। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে জাতির পিতার আদর্শে তথা মুজিবীয় ভাবধারায়। এই আদর্শ অনুসরণ করে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে, কেন্দ্র থেকে প্রান্তিক জনপদ পর্যন্ত সংস্কৃতিচর্চার একটি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারের হাত ধরে বাংলাদেশ আজ জীবনযাত্রার নব নব অভিযাত্রায় উন্নতির জোয়ারে ভাসছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পাশাপাশি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষের

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান্নোয়নসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনীতিচর্চা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার পূরণ সম্ভব হয়েছে। রাস্তাঘাট, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও সোলার পোঁছে দেওয়া, ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে শেখ হাসিনা ও তাঁর আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় পর্যায়কে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে।

বাংলাদেশ এমডিজির লক্ষ্য সফলভাবে পূরণ করে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এসডিজির লক্ষ্য পূরণের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়নে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। জনগণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বারবার আস্থা রেখেছে। মানুষের সেই আস্থার প্রমাণ দেখি দেশে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দিয়ে বারবার আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করার মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালে জাতির পিতার নেতৃত্বের প্রতি ভরসা রেখে বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করেছে, তেমনি শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি দেশের জনগণের বারবার আস্থা রাখার ফল আমরা পাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বর্তমানে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি সংস্কৃতিগতভাবে এগিয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংস্কৃতিগত পদক্ষেপ নতুন প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করছে। দেশে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে জনগণের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি এদেশের জনগণ বাঙালি সংস্কৃতিকে বিশ্ব পরিমণ্ডলেও পরিচিত করে তুলছে। এই সংস্কৃতিচর্চা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিবেশ সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে। শেখ হাসিনার সরকার বাঙালি জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সাহিত্য ও গবেষণামূলক কাজ সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে প্রযুক্তি যুক্ত করে প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন ও নিজস্ব সংস্কৃতিতে বলীয়ান শিক্ষিত জাতি হিসেবে আমাদের গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

আমাদের দেশে তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার তৃণমূলের সেই প্রতিভা জাতীয় পর্যায়ে প্রকৃত পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে বিকাশের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসাম্প্রদায়িক চেতনা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের হাত ধরে দেশে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক

চেতনার বিকাশ হচ্ছে। জ্ঞানচর্চার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, শিল্প-সাহিত্যচর্চার প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টি, গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে দেশ আজ রুচিশীলতার আলো ছড়াচ্ছে। আজ আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশে সংস্কৃতবান আলোকিত মানুষ তৈরির প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
আওয়ামী লীগ সরকার শুধু যাতায়াত ব্যবস্থা কিংবা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছে তা নয়, এর পাশাপাশি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নানারকম পদক্ষেপ হাতে নিয়ে তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজ লক্ষ্য করলে তার প্রমাণ মেলে। যেমন- জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চারু-কারু এবং ললিত কলার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; জাতীয় গ্রন্থাগার/গণগ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও প্রবর্ধন; জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলার প্রচলনে সহায়তা; জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং চারুকলার বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান; বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সাংস্কৃতিক ভাবের আদান-প্রদান; পল্লি সাহিত্য, পল্লি সংস্কৃতি ও পল্লি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা; শিল্পী, লেখক কিংবা সাহিত্যিকদের পেনশন প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার সম্পূর্ণ সফলতার পরিচয় দিয়েছে। সরকার এরইমধ্যে প্রায় ১৮৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১ টি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ১৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ব্যাপক ইতিবাচক বিবর্তন এনেছে। আজ গ্রামে ইন্টারনেট সংযোগ থাকায় গ্রাম ও শহরে মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের ফলে গ্রামের মানুষ হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্যপালন ও কৃষিজাত দ্রব্য খুব দ্রুত দেশের সর্বত্র পাঠাতে পারছে। এতে করে গ্রামীণ অর্থনীতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি জাতীয় পর্যায়ে নিজের অবস্থান শক্ত করে তুলেছে। এছাড়াও গ্রামে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম অর্জন।

একটি দেশে মাঝে মাঝে এক শ্রেণির অপশক্তির দ্বারা জাতীয় সংস্কৃতি আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এই ধরনের অপশক্তি দেশ ও

জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে চায়। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পাকিস্তানি-বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা বাঙালি সংস্কৃতির উপর চরম আঘাত করে। পাকিস্তানিরা তাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনেও বাংলাদেশকে সংস্কৃতিগতভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে বাঙালি সংস্কৃতিকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলো সেই অপশক্তি। কিন্তু মুজিবীয় আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনার ধারক ও বাহক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার সকল অপশক্তিকে পরাজিত করে বর্তমানে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্ব-পরিমণ্ডলে প্রতিনিয়ত পরিচিত করে তুলছে।

১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির একটি অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিশ্ব অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে’ জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার সেই বক্তব্যকে প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই বলেন, ‘ আমি বিশ্বাস করি জাতির পিতার সাংস্কৃতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করা আমাদের কর্তব্য’দেশের জনগণ বর্তমানে যে উন্নতির স্বাদ পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে।

আসন্ন বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে জনগণ বরাবরের মতো শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি আস্থা রাখবে নিঃসন্দেহে। কেননা, বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতার আদর্শ, শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বিশ্বাস করে। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের উন্নয়নের জোয়ার ও জাতির পিতার সাংস্কৃতিক দর্শনকে সমুন্নত রাখতে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের জনগণের সামষ্টিক ইতিবাচক স্বার্থের জন্য অপরিহার্য।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা।

২০০১ সালের রামশীল যেন একাত্তরের শরণার্থী শিবির

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন মানেই অনেক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এখন আতঙ্কের আরেক নাম। দুরারোগ্য অসুখের মতো বাংলাদেশের বুকে লেগে থাকা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এমনিতেই সারা বছর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনের বিশেষ দিনগুলোতেই অত্যাচার অব্যাহত রাখে। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন এলে তাদের জীবন-সম্ভ্রম-সম্পদের ওপর নেমে আসে জামায়াত-বিএনপি সিন্ডিকেটের হিংস্র কার্যকলাপ। বিশেষ করে ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর তো রীতিমতো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের সম্পদ লুট, হত্যা, ধর্ষণ, চাদাবাজি চলেছে। সেই কালযুগের ভিক্টিমরা আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে আবার আতঙ্কিত।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্তদের ওপর চালানো আক্রমণ থেকে বাঁচতে প্রায় ২০ হাজার মানুষ রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এটি গোপালঞ্জের কোটালীপাড়ায় ১২টি ইউনিয়নের একটি রামশীল। বাগেরহাট বরিশালের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সেদিন কোটালীপাড়ার রামশীলকেই নিরাপদ ভেবে আশ্রয় নিয়েছিল। এক কাপড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বের হয়ে যেতে বাধ্য হওয়া কপর্দকশূন্য মানুষগুলোর পাশে সেদিন রামশীলের মানুষ নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিএনপি-জামায়াতের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার ওই জনগোষ্ঠীকে সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন রামশীলবাসী। ইউনিয়নটি পরিণত হয়েছিলো ১৯৭১ সালের মতোই এক শরণার্থী শিবিরে। যা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও আলোচিত হয়েছিল।

২০০১ সালের ৪ অক্টোবর রামশীলে ঘরহারা নির্যাতিত মানুষ আসতে শুরু করে বানের জলের মতো। তখনকার সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, বাগেরহাটের মোল্লাহার এলাকা থেকে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমান নির্যাতিতরাও হাজারে হাজারে রামশীল ইউনিয়নে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। বাস্তুচ্যুত এসব হতভাগ্যদের মধ্যে অনেক ধর্ষিত নারী ছিলেন বলে সেই সময়ের গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। নির্যাতিতরা কোনোপ্রকার চিকিৎসাসেবা না পেয়েই প্রাণ হাতে

এলাকা ত্যাগ করেছিলেন সেদিন। কারণ নির্বাচনে জেতার পর বিএনপির নির্বাচিতরা সেখানে সরকারি-বেসরকারি সব সাহায্য পাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

বাগেরহাটে ২০০১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক আগে বাগেরহাট-১ (চিতলমারী-মোল্লাহাট-ফকিরহাট) ও বাগেরহাট-২ (সদর-কচুয়া) আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দিনের নির্বাচনী জনসভায় বোমা বিস্ফোরণে জনসভায় আসা আট জন নারী-পুরুষ নিহত হন। ভয়ঙ্কর এই ঘটনায় জড়িত ছিল হরতাকুল জিহাদ এবং বিএনপি জামায়াতের স্থানীয় নেতারা। নির্বাচনের পর ওই জেলার মোল্লাহাট উপজেলার জয়ঘা, চাঁদেরহাট, মাদারতলি, বুড়িগাংনি, বড়গাওলা, চাঘদা আক্রান্ত হয়। বেছে বেছে এই গ্রামগুলোতে তাণ্ডব চালানোর কারণ, এগুলো হিন্দু অধ্যুষিত।

বাগেরহাটের পাশাপাশি বরিশালও সহ্য করেছে ২০০১ সালের জামায়াত-বিএনপির নৃশংসতা। বরিশালের গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এবং হিন্দু সস্প্রদায়ের মানুষজনের ওপর চালানো বর্বরতা সারা পৃথিবীতে সমালোচিত হয়েছিলো। ২০০১ সালে বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা আগৈলঝাড়ার বাশাইলের ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন মোল্লাকে অপহরণ করে হত্যা করে। সরকারি গৌরনদী কলেজ ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক সফিকুল ইসলাম বুলেটকে গৌরনদী বন্দরে দিনের বেলাতেই ইট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। বরিশাল নগরীর আমানতগঞ্জ এলাকার ছাত্রলীগ নেতা মাসুম সিকদারকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

২০০১ সালে জামায়াত-বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকারের কর্মীবাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয় বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ধানডোবা গ্রামের ৩০টি, চাঁদশী গ্রামের ২০টি, খাঞ্জাপুর গ্রামের ১৫টি, বিল্লগ্রামের ২৫টি, ইল্লা গ্রামের ৫টি, গেরাকুল গ্রামের ৫টি এবং আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার গ্রামের ৫০টি, বাহাদুরপুর গ্রামের ৩০টি, বাকাল গ্রামের ২৫টি, রামানন্দেরআঁক গ্রামের ২৫টি, পতিহার গ্রামের ৩০টিসহ কয়েকশত পরিবার। বিকৃত রুচির এসব সন্ত্রাসী হিংস্রতা থেকে বাঁচতে হিন্দু পরিবারগুলোর নারী সদস্যরা অধিকাংশই গোপনে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যাদের সেই উপায় ছিলো না, তারা বিএনপি সন্ত্রাসীদের কালো থাবা থেকে বাঁচতে রাতের আঁধারে নির্জন পুকুর কিংবা দিঘির মাঝখানে কলাগাছের ভেলা বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গৌরনদীর বিভিন্ন গ্রামের অসংখ্য পরিবার নির্যাতনের শিকার হয়ে বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

রামশীলে আশ্রয় নিতে আসা অনেক শিশু নিয়মিত খেতে পায়নি। এক বাড়িতেই প্রায় ২০০ আহত ব্যক্তি চিকিৎসা নিয়েছে। অনেক ধর্ষিত নারীকে আত্মহত্যার পথ থেকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করা হয়েছে বলে পরবর্তীতে জানিয়েছেন রামশীলের মানুষ। বরিশাল এবং বাগেরহাট থেকে রামশীলে এসে জামায়াত-বিএনপির সন্ত্রাসীরা হামলা করতে পারে এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিলো। এমন ভয়াবহ বিপদ মোকাবেলা করতে সেখানে সেদিন গড়ে তোলা হয়েছিলো ২১ সদস্যের কমিটি। কিন্তু হতভাগ্য এসব মানুষ রামশীলেও স্বস্তি পায়নি। জামায়াত- বিএনপির স্থানীয় প্রশাসন বরিশাল-বাগেরহাটের ওইসব শরণার্থীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে চাপ দেয়া শুরু করে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী রামশীল আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনের কথা দিয়েও যাননি।

২০০১ সালের ১২ অক্টোবর তৎকালীন গোপালগঞ্জ ও বরিশালের ডিসি, এসপি আসেন রামশীলের শরণার্থীদের খবর নিতে। তারাও অত্যাচারিত মানুষদেরকে নিজ গ্রামে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু যারা ফেরার চেষ্টা করেছে, তারা পথেই জামায়াত-বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে মার খেয়েছে। সন্ত্রাসীদের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে আবারও পালাতে হয়েছে তাদেরকে।

দলীয় অবস্থান থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রামশীলে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের পাশে ছিলো। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সময় ব্যক্তিগতভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে।

ঘটনার ১০ বছর পর হিন্দু সম্প্রদায়, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিশনের সদস্যরা ২০১০ সালের ১৭ এপ্রিল রামশীল ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। নির্যাতিত ব্যক্তিদের আশ্রয়দানকারীদের ১৪জন ব্যক্তি তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক জেলা ও দায়রা জজ মো. সাহাবুদ্দিন আহম্মদ, সদস্য শহিদুল ইসলাম ও মনোয়ার হোসেনের কাছে সাক্ষ্য দেন। শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে নির্যাতিত মানুষের দুঃসহ স্মৃতি আজও রামশীলবাসীদের মনে দাগ কেটে আছে।